যে থিয়েটার করতে চেয়েছিলেন

অংশুমান ভৌমিক

অনেকদিন আগে ১৯৫১ সালে বাংলা থিয়েটার নামে একটি লেখায় শম্ভু মিত্র লিখেছিলেন — বিদেশিদের কাছে ধার করা জিনিস নিয়ে নাচানাচি করছি, এই ব্যঙ্গ করলে পরাধীন জাতির আত্মাভিমানে ঘা লাগে। এবং হৃদয়ের নির্দেশ অমান্য করে জোর করে উল্টো পথে চলে আমরা প্রমাণ করতে চাই যে, দেশাত্মবোধে আমরা কারও চেয়ে কম নই। কিন্তু এ প্রচেষ্টা আজও পর্যন্ত নন্দিত হয়নি সাধারণ্যে। বাঙালি থিয়েটার ভালোবাসে। শুধু শহুরে বাবুরা নয়, গ্রামের চাষীরাও। এই যাত্রা তাই থিয়েটারের পদাঙ্ক অনুসরণকারী, প্রতিপক্ষ নয়। অর্থাৎ বহুরূপী'র প্রধান নট ও নির্দেশক মেনে নিয়েছিলেন যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্টের পর স্বাধীন দেশের বুকে তাঁর দল বা তাঁদের মত আরও কেউ কেউ যে নাট্যচর্চা শুরু করেছিল, তা আসলে ওই সাহেবদের শেখানো প্রসেনিয়াম থিয়েটারের অনুব্রজন করে চলা। সেই কবেকার সাঁ সুসি বা চৌরঙ্গি থিয়েটারে যে ধরনের নাটক হত, যে রকমের নাটকের আদলে বেলগাছিয়া, পাইকপাড়া, পাথুরিয়াঘাটা বা অন্য অনেক বাবু বাড়ির নাটমন্দিরে বঙ্গসন্তানদের শৌখিন নাট্যচর্চার শুরু হয়েছিল, যার খেই ধরে গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু করে তাঁর গুরু শিশির ভাদুড়ি পেশাদার থিয়েটারের পতাকা উড়িয়েছেন, তার খোল বা নলচে কোনওটাই দেশি নয়। সেটি ধার করা।

ধার করা জিনিসকে নিজের বলে চালানোর মধ্যে একধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা আছে। অথচ দেশ থেকে লালমুখো সাহেবের পাল মানে মানে বিদায় হয়েছে বলে স্বাদেশিকতার দোহাই দিয়ে বা নবনাট্য লেবেল সেঁটে রাতারাতি কোনও বদল আনার মতো পরিস্থিতি নেই। এ তো টেক্সটবুক নয় যে কমিশন গড়া হল আর ১৮৫৭ সালে যা হয়েছিল তার নাম সিপাহী বিদ্রোহ না বলে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলার নিদান হেঁকে দিলাম। শত্তুরের মুখে ছাই লেপে দেওয়া সোজা, কিন্তু একশো দেড়শো বছর ধরে বিলিতি থিয়েটারের যে ধাঁচা শহর থেকে দূরে, আরো দূরে ছড়িয়ে পড়েছে, তার সঙ্গে আপাতত সন্ধি স্থাপন না করলে থিয়েটার বস্তুটিই উবে যেতে পারে। যেমন দেশজুড়ে লিঙ্ক ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ইংরেজিকেও রাজভাষার তক্‌মা দিয়ে হয়েছে, তেমন প্রসেনিয়াম থিয়েটারকেও দিতে হবে বৈকি!

এই ভাবনাকে সামনে রেখেই বহুরূপী পথ চলা শুরু করেছিল। শম্ভু মিত্র কোনওদিন সে দলের সভাপতি হননি। সম্পাদকও হননি। কিন্তু যতদিন বহুরূপী তে ছিলেন ততদিন তাঁর শিল্প-দর্শনকে শিরোধার্য করেই দল চলেছে। ১৯৪৯ সালের 'পথিক' থেকে ১৯৭১ সালের 'চোপ আদালত চলছে' — সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। এই ট্র্যাডিশনের আনাচে কানাচে চোখ রাখলে ক্রমবিবর্তনের একটি ছবি স্পষ্ট হয়। কেউ কেউ বলার চেষ্টা করেন বহুরূপী গড়ে ওঠার পর শম্ভু মিত্রের প্রথম নাটক নবান্ন। এ দাবি অসাড়। কারণ বহুরূপী নামটিরই তখন কোনও অস্তিত্ব ছিল না। শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের যুগ্ম পরিচালনায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নবান্ন প্রযোজনার সঙ্গে এই নবীকৃত নবান্ন-র ফারাক ছিল না বললেই চলে। তাছাড়া ভারতীয় গণনাট্য সংঘের নবান্ন-এ যাঁরা অভিনয় করতেন তাঁদের অনেকে এই নবান্ন-তেও ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা নবীকৃত নবান্ন-এর অভিনয় হয়েছিল হাতে গোণা। আর আমন্ত্রিত অভিনয়? একটিও নয়। ফেলে আসা মতাদর্শের বোঝা সাত তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখেছিলেন শম্ভু মিত্র ও তাঁর সঙ্গীরা।

১৯৪৯ সালে তুলসী লাহিড়ীর পথিক প্রযোজনা করেই খাতা খুলেছিল বহুরূপী। যে নবনাট্যের সন্ধানে বহুরূপীর পথ চলা শুরু, তার একটি প্রাথমিক শর্তই ছিল নতুন নাট্যকারদের বরণ করা। তুলসী লাহিড়ী সে সময়ের প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার। তাই একে একে তাঁর পথিক, ছেঁড়া তার প্রযোজনা করেছে বহুরূপী। সে আমলে জনপ্রিয় মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্যের সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য ছিল বহুরূপীর সামাজিক দায়িত্ববোধ সংক্রান্ত শপথের। তাই বলে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ঘনিষ্ঠ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক কুমার ঘটকের কাছেও হাত পাতেননি শম্ভু মিত্র। নিজে কলম ধরেছেন। লিখেছেন উলুখাগড়া, বিভাব। এর মধ্যে দ্বিতীয় নাটকটি তাঁর নিজের খুব প্রিয় ছিল। নাটকের ফর্ম ও প্রেজেন্টেশন নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্ট তিনি করতে চেয়েছিলেন, সেই সুযোগ কড়ায় গণ্ডায় উশুল করেছিলেন বিভাব -এ। দর্শক তৈরী থাকলে এ নাটকের অনেক অভিনয় হতে পারত। এরপরই শম্ভু মিত্র হাত দিলেন চার অধ্যায়-এ। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি আগেও কাজ করেছেন। করেছেন পরেও। কিন্তু স্বাধীনতার চার বছরের মাথায় একটি রবীন্দ্র উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে নির্দেশনা দেওয়ার মূলে ছিল সন্ত্রাসবাদী স্বাধীনতা আন্দোলনের দার্শনিক ভিত্তিকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানো। স্কুলপাঠ্যে ক্ষুদিরাম বসুকে সন্ত্রাসবাদী বলা উচিত হয়েছে কিনা তা নিয়ে এখন চাপানউতোর চলছে। ইন্দ্রনাথ-অতীন-এলাদের মত স্বঘোষিত সন্ত্রাসবাদীদের পথ ও পাথেয় নিয়ে সেই ১৯৫১ সালেই জিজ্ঞাসু হয়েছিলেন শম্ভু মিত্র। নিজের মত করে একটি উত্তর খাড়াও করেছিলেন তিনি। আম আদমিকে লুঠ করে স্বরাজ আনার রাজসূয় যজ্ঞকে একরকম নিন্দাই করেছিল তাঁর চার অধ্যায়।

এইসময় থেকেই বহুরূপীর বেশিরভাগ নাটকে সমষ্টির চাইতে ব্যক্তিকেই প্রাধান্য পেতে দেখি আমরা। তাই বলে বার্ণার্ড শ -এর মতো ম্যান এন্ড সুপারম্যান-এক ধন্দে পড়েননি শম্ভু মিত্র। তাঁর অনুমোদন নিয়ে আন্তেন চেকভ বা জে বি প্রিস্টলির বাংলা রূপান্তর প্রযোজনা করেছে বহুরূপী। নিজে বঙ্গীকরণ করেছে রিয়েলিস্টিক থিয়েটারের পুরোধা হেনরিক ইবসেনের এনিমি অফ দ্য পিপল-এর। তৈরি হয়েছে দশচক্র। আজ মনে হয় ট্র্যাজিক হিরো ডাক্তার অমলেন্দু বসুর মধ্যে নিজেকেই দেখতে পেয়েছিলেন শম্ভু মিত্র। এর ছবছরের মাথায় আবার ইবসেনে ফিরেছিলেন। ডলস হাউস থেকে গড়ে নিয়েছিলেন পুতুল খেলা। এ নাটকে নারীর স্বাধীন হওয়ার স্পৃহাকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। মনে রাখতে হবে এর কয়েক বছর আগেই বিবাহবিচ্ছেদ সংক্রান্ত ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট তার ঐতিহাসিক রায় জানিয়েছিল। আর এ নাটকের একবছর আগে বহুরূপীর নির্দেশক লিখেছিলেন, 'যে কোনও নাট্যরূপই আমরা অবলম্বন করি না কেন, উদ্দেশ্য হল আজকের দিনের সমস্যাকে দর্শকের মনের সামনে তুলে ধরা। আজকের কষ্টকে আজকের চেষ্টাকে প্রতিফলিত করা।'

শম্ভু মিত্র তাঁর যুগধর্মকে অস্থিমজ্জায় বুঝতেন। তাই বুলুকে এমন মমতা দিয়ে গড়েছিলেন বাংলার মাটিতে। বহুরূপীর রক্তকরবী তো কিংবদন্তি। আমরা এতকাল এ নাটকের প্রয়োগকুশলতায় মগ্ন থেকেছি। রবীন্দ্রনাট্যের প্রথম সফল নির্দেশকের উষ্ণীষ পরিয়েছি শম্ভু মিত্রের মাথায়। কেউ কেউ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের সওগাত হিসেবে একে বুঝতে চেয়েছেন। সত্যি বলতে কী, জওহরলাল নেহরুর সরকার এই প্রযোজনাটিকে যেভাবে বিদেশি অতিথি-অভ্যাগতদের সামনে উপস্থাপনার ব্যবস্থা করেছিল তাতে বুঝতে বাকি থাকে না যে, তারা এই নাটকটিকে ভারতীয় সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠা বলেই বিবেচনা করেছে। আমাদের মনে হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহৎ শিল্প উদ্যোগের ঢালাও বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে একটি নান্দনিক উচ্চারণ হিসাবেও রক্তকরবী কে দেখা উচিত। ভারতীয় গণনাট্য সংঘে থাকার সময় মুক্তধারা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন শম্ভু মিত্র। ১৯৫৯ সালে আবার ফিরিয়েও আনেন। ভাকরা নাঙ্গালের মত বৃহৎ বাঁধ প্রকল্পের বিরুদ্ধে তাঁর কিছু বলার ইচ্ছে হয়েছিল নিশ্চয়ই। নইলে দুবার একই নাটক ফিরিয়ে আনার সাধনা কেন? তাঁকে অরাজনৈতিক কলাকৈবল্যবাদী বলার আগে এই দৃষ্টান্তগুলি মাথায় রাখা উচিত। কাঞ্চনরঙ্গ-এর মত মজাদার নাটকের মধ্যেও সামাজিক প্রহসনের একটি ফল্গুধারা বয়ে গিয়েছে। বিসর্জন, রাজা অয়দিপাউস, রাজা নাটকের মধ্যে আঁধারে আলোর সন্ধান করেছেন শম্ভু মিত্র। বিশেষত শেষ দুটি নাটক সম্বন্ধে তিনি নিজেই অন্ধকারের নাটক শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন। এই অন্ধকারের মধ্যে নেহরুভিযান সোশ্যালিজম-এক ব্যর্থতার হতাশা যেমন আছে, তেমন আছে একের পর এক প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ-বিবাদে লিপ্ত ভারতের বুকে হিংসার বাতাবরণও। এর দরুণ রবীন্দ্রনাটক যে বহুবিধতার মধ্যে দর্শক ও

নাট্যবিদের অনুমোদন পেতে পারে তা আর প্রমাণের অপেক্ষায় থাকল না। এই পর্বে আঙ্গিকের দিক থেকেও একটি নতুন দিগন্তের সন্ধান করেছেন শম্ভু মিত্র। ক্ল্যাসিক্যাল গ্রিক ট্র্যাজেটির আঙ্গিককে বাংলার মঞ্চে এনেছেন। তাঁর সমকালে বাংলায় তো বটেই, ভারতেও গ্রিক-রোমান সূত্র আহরণ করার রেওয়াজ চালু হয়নি।

আমাদের কাছে তাঁর নির্দেশক জীবনের শেষ চারবছরের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যকার বাদল সরকারকে সর্বভারতীয় দর্শকের কাছে উপস্থাপন করার ষোলো আনা কৃতিত্ব তাঁর। ঘটনাচক্রে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' করা হয়নি। কিন্তু 'বাকি ইতিহাস' থেকেই রিয়ালিজম থেকে খানিক সরে কিছুটা অ্যাবসার্ড থিয়েটারের দিকে বাঁক নিল বহুরূপী। ছাত্র রাজনীতির আবর্তে ঢুকে পড়ল নীতিশ সেনের 'বর্বর বাঁশি' দিয়ে। আবার 'পাগলা ঘোড়া'য় ফিরল মৃত্যুচেতনায় আকীর্ণ কিমিতিবাদ। এরপর আর বাংলা নয়, ভারতনাট্যের নয়া ভগীরথদের চিনতে চাইলেন শম্ভু মিত্র। নাটমঞ্চ প্রসার সমিতির অভিনয়ে পেলেন গিরিশ কারনাডকে। বিজয় তেন্ডুলকরকে আনলেন বহুরূপীর প্রযোজনায়। হামেশাই যাতায়াত ছিল মহারাষ্ট্রে। নাড়ি ধরতে দেরি হয়নি। শানতাতা, কোর্ট চালু আছে থেকে চোপ আদালত চলছে যখন হচ্ছে, তখন দেখতে পাই বাস্তবধর্মী নাটক নির্মাণের খড়ির গণ্ডি মুছে ফেলে অনেক দূরে চলে গিয়েছেন শম্ভু মিত্র। পাশে পাচ্ছেন সুদূরের সত্যদেব দুবে, শ্রীরাম লাগুদের।

শেষে ফিরতে চেয়েছিলেন বঙ্গনাট্যের মূলে। চাঁদ বণিকের পালায় ধরা ছিল তাঁর নাট্যদর্শনের সারাৎসার। প্রসন্ন, করন্থ, তনবির, পানিক্কর প্রমুখ সর্বভারতীয় নাট্যমঞ্চে দাপিয়ে বেড়ানোর আগেই লোকায়ত নাট্যনির্মাণের নীল নক্সা ছকেছিলেন শম্ভু মিত্র। আরব্ধ সে কাজ অসম্পূর্ণ থেকেছে। কিছুটা অনিবার্য ভাবেই একা থেকে আরও একা হতে হতে সংগঠনভিত্তিক নাট্যের অঙ্গন থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি। কিন্তু সিকি শতকের এই অভিযাত্রাই বলে দিচ্ছে কেন তাঁকে আধুনিক ভারতনাট্যের প্রথম পুরুষ বলতে আমাদের কোনও সংশয় থাকার কথা নয়। শতবার্ষিকী মূল্যায়নের প্রথম পর্বে এই দিকেই আমাদের দৃষ্টিনিক্ষেপ করা উচিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : আনন্দবাজার পত্রিকা, অংশুমান ভৌমিক